ভেতরে ভয় আছে

(হরর গল্পসংকলন)

লুৎফুল কায়সার

Bhetore Bhoy Achhe
Collection of Horror Stories by Lutful Kaiser

© Lutful Kaiser

ISBN 978-81-958566-8-8

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ : সুমন্ত গুহ
সম্পাদনা ও বর্ণশুদ্ধি : সংকল্প সেনগুপ্ত

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ ৩৭৫ টাকা

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভূমিকা

ছোটোগল্প বেশ ক-টাই লিখেছি। নানান পত্রপত্রিকা আর সংকলনে এসেছে সেগুলো। হররের বাইরে তেমন কিছু লিখতেও পারি না, থ্রিলারের কঠিন কঠিন লজিক মেলানো আমার কাজ নয়।

ওপার বাংলায় লেখালেখির শুরুটা ২০১৮ সালে হলেও, ’২২ সালের মেলাতে ড্রাকুলার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশের পর দুই বাংলার পাঠকরাই বইটিকে বেশ আপন করে নেন। আমার পরিচিতি এ বাংলার পাশাপাশি, ও বাংলাতেও বেড়ে যায়।

বইবন্ধু প্রকাশনীর কর্ণধার শিবশঙ্করদা যখন গল্পসংকলন করতে চাইলেন, প্রথমে খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম। অনুবাদক হিসাবে মোটামুটি একটু জায়গা পেলেও মৌলিকে এখনও বেশ খানিকটা আনাড়িই রয়ে গিয়েছি।

তারপরেও, হোক-না একটা বই। দেখা যাক কী হয়! প্রথম মৌলিক গল্পসংকলন নিজ দেশ থেকে না হয়ে ওপার বাংলা থেকেই হল। এখন পাঠকদের ভালো লাগলেই আমি ধন্য। ভালো না লাগলে একটু গালমন্দ করে দেবেন, এই আর কী।

বেশির ভাগ গল্পই তো ওপারের ম্যাগাজিনগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন—বুকলুক, কল্পবিশ্ব, পরবাসিয়া পাঁচালী, নভরোজ, ভূততত্ত্ব, অদ্ভুতুড়ে ইত্যাদি। তাই আশা করছি, ওপারের পাঠকেরা আমার এ নিবেদন সাদরে

গ্রহণ করবেন।

গল্পের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট প্রবন্ধও রইল। এখন বাকিটা পাঠকদের হাতে। শিবশঙ্করদা এবং বইবন্ধু প্রকাশনীকে ধন্যবাদ। যাঁরা বইটি কিনেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা কেনেননি, তাঁদেরও ধন্যবাদ।

ভালো থাকবেন সবাই।

লুৎফুল কায়সার
রাজশাহি, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

সমাধি ১১

ইসাদোরা ২২

ওগো সুবর্ণা, জানো কি তুমি, জানো কি? ২৬

ট্রু ইটার ৪০

অসংজ্ঞায়িত ৪৮

অ্যাপোক্যালিপ্স ৬২

আঁধার আর ঈশ্বর ৯৫

আকাশ ১১২

ওয়ান্ডারল্যান্ড ১২৯

ছায়া-কায়া ১৪৩

নাত্তু ১৫৯

পহেলা বৈশাখ ১৭১

পালনকর্তা ১৮৩

প্রভাব.. ২০৩
বাতিঘর.. ২১২
বৃক্ষোভ.. ২২২
ভ্রান্তি.. ২৩১
মায়া.. ২৩৯
মোহ.. ২৪৬
রক্ষক.. ২৫৮
লেখকের মৃত্যু.. ২৬৫
শিস.. ২৭০
দরজা খুলবে না.. ২৮৫
সাইরেন হেড : ইনটারনেট থেকে বাস্তবে.. ২৯২

সমাধি

বইটা হাতে নিয়ে বেশ অবাক হয়েই নেড়েচেড়ে দেখল দোকানদার। এই বই যে তার দোকানে ছিল, সেটাই সে জানত না। অবশ্য পুরোনো বইয়ের দোকানে কত বইই তো আসে। হয়তো বহু আগে কেউ বিক্রি করে গিয়েছিল।

"কত দাম রাখবেন?" বলে উঠল অদিতি।

আবার বইয়ের দিকে তাকাল দোকানদার। সবুজ একটা মলাট, সেখানে কিছুই লেখা নেই। ভিতরটাও তেমন, হাতের লেখা, ইংরেজিতে কী সব লেখা। পাতাগুলো বেশ পুরোনো, হলদেটে হয়ে গেছে। সে ইংরেজি খুব কম বোঝে।

"আপা, এইডা তো ডায়েরি মনে হইতেসে।"

"হ্যাঁ, তা-ই তো দেখছি, এবং বেশ আগের, ইংরেজির ধরন দেখেই বোঝা যায়। কত রাখবেন?"

"আসলে আপা, এই বই সম্ভবত মেলা দিন দোকানে পইড়া আছিল, সত্য কথা কই, আপনি না বাইর করলে মনে হয় না কেউ কিনত। যা দিবেন দেন।"

পার্স থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে দিল অদিতি।

বেশ খুশিই হল দোকানদার। পুরোনো এই বইয়ের বিনিময়ে কেউ দশ

টাকা দিলেও সে দিয়ে দিত, সেখানে একশো টাকা।

রিকশাতে বসে বইটা উলটে-পালটে দেখতে লাগল অদিতি। সম্ভবত বহুকাল আগের কোনো ইংরেজ নাবিকের ডায়েরি এটা।

* * *

নিঃসীম এক প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অদিতি। বহু দূরে দেখা যাচ্ছে আকাশছোঁয়া এক মূর্তি। এমন মূর্তি পৃথিবীর কোনো দেশেই দেখা যায় না।

হয়তো কোনো প্রাচীন উপজাতি এই মূর্তির আরাধনা করত। আকাশের রং কেমন যেন নীলচে সবুজ, ওখানে একটার জায়গাতে রয়েছে তিনটে চাঁদ...

এ কোথায় এসেছে সে?

ধড়ফড় করে উঠল অদিতি, ঘুমটা ভেঙে গেছে ওর। এমন ভয়াবহ স্বপ্ন কেন দেখল ও?

বালিশের নীচ থেকে মোবাইলটা টেনে বের করল সে। রাত আড়াইটা বাজে। ঘুম ভাঙলে আর কেন যেন ঘুম আসতে চায় না ওর।

টেবিলের ওপর রাখা বইটার দিকে নজর পড়ল ওর, আজ বিকালেই কিনে এনেছে সে ওটা। এখনও পড়া শুরু করতে পারেনি।

ওটা নিয়েই যদি কিছু সময় কাটে, তবে মন্দ কী?

* * *

বইটা খুলল অদিতি। প্রথমে কয়েকটা খালি পাতা, হলদেটে হয়ে গেছে সেগুলো।

তার পরের কয়েক পাতা লেখা। পুরোনো আমলের ডায়েরি, ইংরেজিও বেশ কঠিন। পড়তে লাগল অদিতি—

যখন আমি জাহাজ নিয়ে একা বন্দরে ফিরলাম, তখন পুরো শহর জুড়ে

অদ্ভুত গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

এমনকি শহরের সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাটাও একাধিকবার আমাকে প্রশ্ন করল, “বাকিদের কী হয়েছে?” উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না আমার।

কোনোমতে বাড়ি পৌঁছোলাম। ততক্ষণে আমার স্ত্রী-র কানেও সব পৌঁছে গেছে। একটু-আধটু আপ্যায়নের পরে সে-ও ইনিয়েবিনিয়ে সেই একই প্রশ্ন করল।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

এরপর কেটে গেল পুরো তিনটি দিন। বাজার থেকে শুরু করে রাস্তা, যেখানেই যাই, সবার শুধু ওই একই প্রশ্ন! কিন্তু আমি কী উত্তর দেব ওদের? কিছুই যে মনে পড়ছিল না।

ওদিকে আমার একা ফিরে আসার গল্প ধীরে ধীরে ছোট্ট শহরের সীমা পেরিয়ে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ পর লন্ডন থেকে ডাক এল আমার। স্বয়ং রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন।

ওঁর সামনেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ উনিও একই প্রশ্ন করেছিলেন। লোকেরা ভাবল, আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

পাঠিয়ে দেওয়া হল এক পাগলাগারদে। সেখানেই আছি এখন।

কিন্তু কিছুই মনে করতে পারিনি। কী হয়েছিল? পাগলাগারদের দিনগুলো অদ্ভুত। সব কিছুই অদ্ভুত...

এর পরের কয়েকটা পাতা বেশ দ্রুতই পড়ে গেল অদিতি। তেমন বিশেষ কিছু নেই। পাগলাগারদের দিনগুলো আর সেখানকার কিছু মানুষের বর্ণনা। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট পর হুট করে একটা জায়গাতে ওর চোখ আটকে গেল—

ওখানে এক বুড়ো ছিল, অনেক বয়স ব্যাটার। চুল-দাড়ি সব সাদা। বাকি পাগলেরা বলত, ও নাকি বহুকাল ধরে এখানে আছে। ওর চেয়ে পুরোনো আর কেউ নেই।

নিজের ছোট্ট কুঠরিতে একা একা চুপচাপ বসে থাকত সে। কারও সঙ্গে

ইঁদারা

চুপচাপ বসে আকাশ দেখছিলাম। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে ঠিক এইভাবেই জানালা দিয়ে আকাশ দেখি। সন্ধ্যার ঠিক আগের আকাশটাও আমার মতোই নিঃসঙ্গ।

হ্যাঁ, আমি খুব নিঃসঙ্গ। দীর্ঘকাল একা থাকলেও একাকিত্বকে কেন যেন ভালোবাসতে পারিনি আমি। খুবই বৈচিত্র্যহীন জীবন আমার। আজকাল যেন সেটা আরও বেশি বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে! সারাটা দিন বসে থাকি, রাতে টুকটাক এদিক-ওদিক যাই আর তারপর একটা সময়ে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ি!

এভাবেই দিন চলে যায়!

তবে আজকের কথা ভিন্ন! আমার বাড়ির পেছনে যে ছোট্ট জঙ্গলের মতো জায়গাটা আছে, সেখানে দুপুরের দিকে দুজন লোককে বসে থাকতে দেখেছি! ওরা কখন এসেছে, সেটা আমি জানি না। দুপুরের দিকে যখন পেছনের জানালার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই ওদের দেখলাম!

ব্যাপারটা অদ্ভুতই! এই গ্রামের লোকেরা ওই জায়গাটা এড়িয়ে চলে। গত কয়েক বছর ধরে আমি ওখানে কাউকে আসতে দেখিনি।

তবে ওদের দুজনের চেহারা দেখে ওদেরকে গ্রামের লোক বলে মনেও হয়নি! আর ওদের মধ্যে একজনকে কেন যেন আমার বেশ চেনা-চেনা

ঠেকেছে!

আচ্ছা, ওরা এখনও রয়েছে ওখানে? সন্ধ্যা হয়ে গেছে! এখন তো ওদের থাকার কথা নয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কখন পেছনের জানালাটার কাছে চলে গিয়েছি, নিজেই বুঝিনি!

অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে ওরা দুজন তখনও ওখানে বসে রয়েছে!

শুধু বসেই নেই, পুরোনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুনও জ্বেলে ফেলেছে! নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা।

এক অজানা কারণে ওদের কথাগুলো শোনার খুব ইচ্ছা হয়ে গেল। নিঃশব্দে পেছনের দরজা দিয়ে বের হলাম আমি।

প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। তারপর একটা মোটা গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি জানি, এইভাবে লুকিয়ে কারও কথা শোনা ঠিক নয়। কিন্তু তারপরেও কেন যেন মনে হচ্ছিল, ওদের কথা না শুনলে আমার চলবেই না। আগে কিন্তু কখনোই এভাবে মানুষের কথা শুনিনি আমি!

বেশ মন দিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

"তো এই বাড়িটা পোর্তুগিজরা বানিয়েছিল, তা-ই কি?" বলে উঠল প্রথম লোকটা।

"হুম, এখানেই আমি ইসাদোরাকে প্রথম দেখি! ও নিজেও পোর্তুগিজ।" বলল দ্বিতীয় লোকটা।

আমি যেন চমকে উঠলাম! এ কী বলছে লোকটা! এই নামটা এই অঞ্চলের লোকেরা দিনের বেলাতে পর্যন্ত মুখে আনে না। সেখানে ও রাতের বেলাতে এই নাম মুখে আনছে! আর এই দ্বিতীয় লোকটাকে শুরু থেকেই কেন যেন আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল।

"কাম অন অনিমেষ! তুই এখনও এসবে বিশ্বাস করিস?" হাসতে হাসতে বলে উঠল অপরজন।

তার কথায় কান না দিয়ে অনিমেষ নামের লোকটা বলে চলল,

ওগো সুবর্ণা, জানো কি তুমি, জানো কি?

ঘরটার সব কিছু বেশ গোছানো। একটা ফ্রিজ আছে, বেশ সুন্দর একটা টেবিল, টেবিলের পাশে একটা চেয়ার। সেটায় জমে রয়েছে একগাদা কাগজপত্র।

বোঝাই যাচ্ছে, এই ঘরেই নিজের কেসগুলো নিয়ে হোমওয়ার্ক করেন দেশের প্রখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ফারহান জারিফ।

প্লাস্টিকের একটা চেয়ারে বসে আছে সুবর্ণা। বাড়ির কাজের লোকটা একটু আগে ওকে এই ঘরে নিয়ে এসেছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ও, তারপর লোকটা চেয়ারটা দিয়ে গেছে।

বোঝাই যাচ্ছে, এই ঘরে খুব বেশি মানুষ আসে না, এলেও বসে না।

ঘরের সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিসটা হল টেবিলের ঠিক পিছনে দেয়ালে আটকানো প্রায় ত্রিশ ইঞ্চির এলইডি টিভি-টা। ওটাতে একটাই অ্যানিমেশন ঘুরেফিরে বারবার চলছে।

দানবের মতো কদাকার একটা মুখ, মুখের দু-পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য শুঁড়। মুখটার কপালের জায়গাটাতে একটাই চোখ। একটু পরপর খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ওটা।

যেন অতিকায় কোনো জীবন্ত প্রাণী ওকে দেখছে।

যতবারই ওদিকে চোখ যাচ্ছে, গা ঘিনঘিন করে উঠছে সুবর্ণার।

“ওগো সুবর্ণা, জানো কি, তুমি জানো কি?

তুমি আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা!”

পিছে তাকাল সুবর্ণা। প্রায় নিঃশব্দেই ঘরে এসে ঢুকেছে ফারহান জারিফ। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বাতে প্রায় ছয় ফুট এক ইঞ্চি, চেহারাতে বেশ ধারালো একটা ভাব আছে। আকর্ষণীয় পুরুষ!

“স্যরি। আশা করি, বেশি দেরি করলাম না। এই জিঙ্গলটা আগে শুনেছেন?” হাসল সে।

“আপনার গানের গলা দেখি ভালোই। নাহ্ শুনিনি। আমার নাম নিয়ে যে এমন জিঙ্গেল আছে, জানতামই না।” মিষ্টি করে হাসল সুবর্ণা।

“নয়ের দশকে সম্ভবত একটা ট্যালকম পাউডারের বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল ছিল এটা, বি টিভি-তে দিত। এখনও মনে আছে আমার। আপনি তো বেশ সুন্দরী, আপনার সঙ্গে যায়ও জিঙ্গলটা।”

“ওহ্ থ্যাংক ইউ... এর আগে কেউ আমাকে কোনো জিঙ্গল শুনিয়ে প্রশংসা করেনি।”

“হুম, মানে রূপের প্রশংসা মাঝে মাঝেই পান?”

“আরে না না!”

মিথ্যা বলল সুবর্ণা। উচ্চতাতে প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি সে, বাঙালি মেয়ে হিসাবে বেশ লম্বাই। গায়ের রং ফরসা, তবে অতিরিক্ত না, চেহারাতে বেশ একটা ব্যক্তিত্ববোধ আছে, মাথায় ববছাঁট চুল, চোখ দুটো ভাসাভাসা। সব মিলিয়ে মডেল বা নায়িকাদের মতো অপরূপা না হলেও তাকে সুন্দরী বলা চলে, পুরুষদের এসব প্রশংসা সে মাঝে মাঝেই পায়।

আর সাংবাদিকতায় আসার পর তো আরও অনেক মানুষেরই নজরে এসেছে ও। নিঃসন্দেহে এতটা গুরুত্ব পাওয়ার জন্য ওর সৌন্দর্যের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। মুখে না স্বীকার করলেও, ভিতরে ভিতরে এটা বেশ ভালোই বোঝে সে।

“আসলে জানেন, আপনাকে নিয়ে একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে-ই আপনার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই জিঙ্গলটার কথা মনে করিয়ে দিল।”

“আমাকে চেনে? কে সে? আমি কি চিনি তাকে, মি. জারিফ?”

“ওসব কথা পরে হবে।” হাত নাড়ল ফারহান জারিফ, “আর আমাকে ফারহান বলে ডাকবেন। কোল্ড ড্রিংক চলবে?”

“হুম চলবে।”

ফ্রিজ থেকে দুটো পেপসির ক্যান বের করে আনল ফারহান। একটা এগিয়ে দিল সুবর্ণার দিকে।

“আমি আসলে এসেছিলাম ‘দৈনিক শহরের কণ্ঠ’ থেকে।” একটা বেশ লম্বা চুমুক দিয়ে বলল সুবর্ণা।

“হুম, তো আমার কাছে কোনো কাজ? কোনো কেস?”

“আজব, আমাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে একজনের কথা হয়েছে। আর আপনি জানেন না কেন এসেছি?”

“যখনই জানলাম যে সুবর্ণা নামে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়... তখনই ও আমাকে বলল ওসব, শুধু ওটুকুই বলেছে, আপনি কেন এসেছেন, সেটা বলেনি। আপনাকে বেশ পছন্দ করেছে সে। আর সেজন্যই এই ঘরে আপনাকে আনা। এই ঘরে আমি কাউকে আনি না সাধারণত।”

“আমার খুবই জানতে ইচ্ছা করছে, সে কে?”

“পরে হবে সেসব কথা, এখন বলুন, কী করতে পারি? আপনি সাংবাদিক! বাপ রে বাপ।”

“এর আগে কোনো সাংবাদিক আসেনি? আপনি তো দেশে বেশ পরিচিত।”

“আসেনি বলব না, তবে বিশেষ কাউকে তেমন পাত্তা দিইনি, আমি স্পটলাইট ভয় পাই।”

এটা জানে সুবর্ণা। এর আগে কোনো খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিককে সময় দেয়নি ফারহান জারিফ। সে ভেবেছিল যে ও সাংবাদিক

শোনার পর ওকেও দেবে না। কিন্তু...

"হুম, তো, কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?" একটা সিগারেট ধরাল ফারহান, "স্মোকিং-এ প্রবলেম হয় না তো আপনার?"

"না না, একটা ইনটারভিউ নিতে চাই আমি আপনার।"

"অবশ্যই, শুরু করুন।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ! এখন না তো কখন?"

"মানে আমি ভেবেছিলাম, আপনি অন্য কোনো সময়ে আসতে বলবেন।"

"আরে না না, আমি খেটে-খাওয়া মানুষ, এখন কাজ নেই, এখনই শুরু করুন। প্রিপারেশন আছে তো?"

"হ্যাঁ, আছে, সব সময়ই থাকে।"

"শুরু করুন তবে।"

মোবাইল বের করে টেবিলের ওপর রাখল সুবর্ণা, তারপর ভয়েস রেকর্ডারটা অন করল।

"আচ্ছা।" একটু থামল সে, "সাধারণ ইনটারভিউগুলো যেমন হয়, প্রথমেই প্রশ্ন করা হয়, কেন লাইনে এলেন? কেন গোয়েন্দা না হয়ে অন্য কিছু হলেন না? এসব প্রশ্ন আমার ভালো লাগে না। আর যদি করিও, তবে পরে করব। সরাসরি কথায় আসি—ঠিক আছে? আপনি বিশেষ একপ্রকার রহস্য নিয়ে কাজ করেন... ব্যাপারটা আপনার মুখেই শুনতে চাই।"

"বেশ বেশ।" হাসল ফারহান, "আমি সেই ধরনের কেসগুলো নিয়েই কাজ করি, যেগুলোকে ভৌতিক অপকাণ্ড বলে চালিয়ে দেওয়া হয় বা হয়েছিল।"

"আচ্ছা, ২০১৫ সালে কলেজ ছাত্রী ফারহানা হকের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করে পুরো দেশে সাড়া ফেলে দেন আপনি। যেখানে ফারহানা মারা গিয়েছিল ১৯৯৩ সালে। প্রায় বিশ বছর আগে। কী করে শুরু করলেন ব্যাপারটা?"

"সব কিছু বলব? বিস্তারিত?"

"হ্যাঁ, বলতে পারেন।"

"আচ্ছা, ফারহানা হকের ব্যাপারটা আমি প্রথমে শুনি একটা রেডিয়ো শো-তে। রাত জেগে এফএম রেডিয়ো শোনার অভ্যাস আমার, আর এই ভূতুড়ে শোগুলোই শুনি। আপনি মন দিয়ে শুনলেই বুঝবেন, প্রতিটি কাহিনিতে প্রচুর অসংগতি আছে। মাঝে মাঝে হত্যা বা ধর্ষণকেও ভূতুড়ে ব্যাপার বলে চালানো হয়। যা-ই হোক... ফারহানার কাহিনি বলেছিলেন তাদের এলাকার একটা লোক। দীর্ঘকাল ওদের এলাকাতে পুরো ঘটনাটা প্রায় কিংবদন্তি পর্যায়ের ভূতুড়ে কাহিনি হিসাবে প্রচলিত ছিল, এমনকি ধরুন, এখনও অনেকেই ওই ভূতুড়ে কাহিনিই বিশ্বাস করে। তো কাহিনিটা ছোটো করে বললে হয় এমন, ফারহানার মা বহু আগেই মারা গিয়েছিলেন। নিজের বাবা আর চাচার সঙ্গে বাড়িতে থাকত ফারহানা। ওর চাচার বয়সও বেশি ছিল না, ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে। ফারহানার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়ো ছিল সে। কলেজে ইনটার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত ফারহানা।

"তো একদিন নাকি ফারহানা কলেজ থেকে ফিরে ওর বাবাকে বলল যে ওর শরীরটা ভালো না, তারপর ঘুমোতে চলে গেল। সেদিন ছিল সোমবার। ওর চাচা গিয়েছিল ভার্সিটিতে। ওদের বাড়ির একজন ঠিকে ঝি ছিল, তিনি রান্নাবান্না করে দিয়ে যেতেন। সেদিন ফারহানার বাবা খাওয়ার টেবিলে বসে সেই মহিলাকে পাঠান ফারহানাকে ঘর থেকে ডেকে আনতে। মহিলা গিয়ে দেখে যে ফারহানা নেই! এখানে-ওখানে দেখে কোথাও মহিলা খুঁজে পায় না ফারহানাকে। তারপর ওর বাবাকে এসে বলে যে ফারহানাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর বাবা অবাক হয়ে যান, কারণ ফারহানা ঘরে ঢোকার পরে বলতে গেলে সারাটা দিনই দরজার সামনে বসে সংবাদপত্র পড়েছেন তিনি। ফারহানা যদি বাইরে যেত তাহলে তিনি দেখতে পেতেন। তারপরেও পুরো বাড়ি, পাড়া খোঁজা হল... কোথাও নেই ফারহানা। ওর বান্ধবীদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হল... সেখানেও নেই। বিকালের দিকে ওর চাচা এসে পড়ল ভার্সিটি থেকে। দুজন মিলে আবার খুঁজলেন, কোনো খবর নেই। এভাবেই দুটো দিন পার হয়ে গেল, কোনো খোঁজ নেই ফারহানার। ব্যাপারটা থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়াল। দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ। কিন্তু